OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 260 - 269
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল ফজলের ছোটগল্প : সমাজচিত্র

অধ্যাপক ড. মোমেনুর রসুল
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : momenurrasul3@du.ac.bd

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Conflict, Poverty, Society, Crisis, Despair, Reality.

Abstract
Literature speaks of society, it speaks of people. Because a writer is the most emotional person in the society. Therefore, any special emotion, crisis, conflict in the life of the society, country, people makes the writer think. Abul Fazal, one of the great 20th century factionalists. He believed that only a writer could be able to express truth in society through his writings. Abul Fazal as a writer has explored various aspects of modern life reality in his short stories such as various crises of society, poverty, mental turmoil, fluctuations of hope and despair. In his short stories, the author depicts the reality of the obstacles that the subtle events of the society create in the way of individual life. On the other hand, short stories are the special medium of expression in literature where fragmentary images of social life are presented in terms of reality. Abul Fazal is a unique genius in drawing this picture.

Discussion

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পূর্বেই অবিভক্ত বাংলায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এর ফলে বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংঘ গঠনের ধারাবাহিকতায় সাহিত্য-সমাজ ভাবনায় প্রগতিশীল-সৃজনশীল কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)। কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) নেতৃত্বাধীন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অন্যতম তরুণ সদস্য ছিলেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। সমকালীন সাহিত্যে আবুল ফজলই সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিলেন।

> "এজন্য তাঁর জীবন-বীক্ষায় আমরা মুক্তবুদ্ধি স্বচ্ছচিন্তা ও উদার মানসিকতার পরিচয় পাই।"[১]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আবুল ফজলের দীর্ঘ আশি বছরের জীবনকালে তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা - পরাধীন ব্রিটিশ আমল, বিভাগোত্তর পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আমল। এ দীর্ঘ

সময়ে ছয়টি উপন্যাস, চল্লিশটি ছোটগল্প, এগারোটি নাটক, অজস্র প্রবন্ধ, তিনটি আত্মকাহিনি, পাঁচটি স্মৃতিকথা, একটি ভ্রমণ কাহিনি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর সরব উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য।

> "তবে তাঁর শিল্পীসত্তার মূল প্রবণতা কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত।"[২]

সাহিত্যের সপ্তপর্ণে বিচরণ করলেও গল্প রচনায় তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছেন। মানবতন্ত্রী এই লেখকের গল্পসাহিত্যে বিষয় রূপে প্রতিফলিত হয়েছে প্রগতিশীল সমাজচেতনা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবালুতা, স্বপ্নকাতরতা প্রভৃতি। গল্পে মানবীয় বিষয়কে গল্পকার শাস্ত্রের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি বরং শিল্পের স্বার্থে, শাস্ত্রীয় নির্দেশকে মানবীয় করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি একাধারে সৃষ্টিশীল ও মননশীল লেখক। আবুল ফজল মনে করতেন, মননশীল চর্চার দ্বারা ব্যক্তির চিত্ত জাগ্রত হয়। আর জাগ্রত চিত্ত অর্থাৎ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং জীবনের মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিই সমাজের সচলতা রক্ষা করে। তাঁর সমগ্র গল্পসাহিত্যে ব্যক্তি এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় আবুল ফজলের অবদান বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্ম চিহ্নিত। কারণ -

> "নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক অসঙ্গতির চিত্র-অঙ্কনের চল্লিশ দশকী মৌল প্রবণতার পথ ছেড়ে গল্পে তিনি বিচরণ করেছেন গ্রামীণ জীবনতটে, গ্রামের নিরন্ন-নিঃস্ব খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা-সংগ্রাম ও দহনের পোড়াজমিতে, আবুল ফজল শ্রেণিসচেতন শিল্পী, তাই বস্তুবাদী সমাজচিন্তার আলোকে তিনি তুলে ধরেন গ্রামীণ মহাজনশ্রেণির শোষণের চিত্র, নির্মাণ করেন সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের জয়গাথা। শাসন নামক শোষণ যেন এক প্রকার নিপীড়ন, সে কথা বোঝাতেই তাঁর প্রতিবাদী বাঁক।"[৩]

আবুল ফজলের গল্পগন্থের সংখ্যা তিন। এগুলো হল - *মাটির পৃথিবী* (১৯৪০), *আয়ষা* (১৯৫১) এবং *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮)। এছাড়া *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬৪), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮) নামক দুটো গল্প সংকলন গ্রন্থ রয়েছে। *সপ্তপর্ণা* (১৯৬৪) নামে অন্য একটি গ্রন্থে বিবিধ রচনার সাথে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে। আবুল ফজলের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংকলন থেকে এ সমস্ত গল্প পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *আবুল ফজল রচনাবলী* (২য় খণ্ড) তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জনজীবনের সার্থক রূপকার আবুল ফজলের গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। সমাজসচেতন আবুল ফজল তাঁর গল্পসমূহে সমাজজীবনের নানাবিধ সমস্যা, যেমন - ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা, ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট তথা মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস প্রভৃতি বিষয় রূপে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবুল ফজলের গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের বিচিত্রমাত্রিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সার্থকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এই মহৎ, মননশীল এবং মানবতাবাদী সাহিত্যিকের ছোটগল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের স্বরূপ সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সুভাষ দে বলেছেন -

> "মূলত ছোটগল্পে আবুল ফজল সমাজ ও মানুষকে যেভাবে চিনেছেন সেই চেনাটাই বড় কথা নয়, বরং সমাজ ও মানুষগুলো তার চারপাশের জগৎকে চিনে, তার সব সবলতা দুর্বলতাগুলোকে নিরীক্ষা করে যদি পরিবর্তনের হাওয়াকে জড়িয়ে নিতে পারে তবেই সমাজ তার জগদ্দল অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে, এ মিশন ও ভিশন নিয়ে তিনি ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন। বিশেষত মুসলমান সমাজচিত্র অঙ্কনে এ ধরনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর আগে কেউ দেন নি। তাঁর ছোটগল্পের অধিকাংশ প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়েই তিনি পরিবর্তনের ইঙ্গিতটিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।"[৪]

আবুল ফজলের প্রথম গল্পগ্রন্থ *মাটির পৃথিবী*। এই গল্পগ্রন্থে মোট সতেরটি গল্প অন্তর্ভুক্ত। গল্পসমূহ হল - 'আয়ষা', 'একখানি হাসি', 'হাকিম', 'পরদেশিয়া', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'লাঠ্যৌষধ', 'আলো ছায়া', 'শরীফ', 'আহমদ', 'নবাব-আমীর-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাদশাহ', 'চোর', 'পরিণাম', 'দুই রাত্রি', 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' এবং 'মাটির পৃথিবী'। অধিকাংশ গল্পেই লেখকের সমাজচেতনা দারুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। গল্পগুলোতে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন চিত্র, বিশেষত মুসলিম সমাজের নানামুখী চিত্র, ধর্মের আড়ালে মুখোশধারী মানুষের ভণ্ডামি। আবার রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী আভিজাত্যগর্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের অধঃপতনের চিত্র। ব্যক্তি ও সমাজের নানামুখী সংকট চিত্রণে লেখক অনন্য করণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এসব গল্পে। 'মাটির পৃথিবী' (১৩৪৩) গল্পে একটি বিশেষ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজজীবনের, বিশেষত শিক্ষার আলো-বঞ্চিত দরিদ্র ও অন্ধ-সংস্কার-জর্জরিত জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে সমাজ সংকট ও ব্যক্তি সংকটের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংকুল পরিবেশে শাশুড়ি-পুত্রবধূর একঘেঁয়ে সনাতন ঝগড়ার বর্ণনা গল্পটিকে ক্লিশে করে তুলেছে। নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত এই পরিবারের অর্থনৈতিক ভিতটি যেমন মজবুত নয় তেমনি তাদের সামাজিক ভিতটিও সরল সুখের নয়। সমাজের এই সংকটাপন্ন শ্রেণিবিন্যাসে অতিষ্ঠ শাশুড়ি-পুত্রবধূর ব্যক্তিক সংকটও তাই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে গল্পের শেষাংশে এসব জটিলতাকে উপেক্ষা করেও স্নেহবৎসল মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে গল্পের শিল্পসৌন্দর্য। একই সাথে গল্পে নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত, বিপর্যস্ত, কুসংস্কারদীর্ণ মুসলিম সমাজের সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনে এবং আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ সৃজনে আবুল ফজলের ক্ষমতা অসাধারণ। সেকারণে ছলিমন, তজু, ফুলজানের মা, তজুর মা, তজুর স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র বিশেষত তজুর স্ত্রী খাতুন চরিত্র গল্পে উজ্জ্বলরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র তজু সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষ। সমাজের নিম্নে তার অবস্থান হওয়ায় ব্যক্তিক অবস্থানও তার নিম্নগামী। তাই সমাজের সংকট ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বময়তার সংকটে তজু নিমজ্জিত হয়েই নিজের সন্তানকে প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। তজুর এরূপ ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কনে আবুল ফজলের ভাষা হয় নিম্নরূপ -

> "রাত্রে খাবার পালা।
> বড় ছেলে মন্নু ভাতের থালা নিয়ে ঠায় বসে আছে।
> টুনি বলে উঠল : অ-বাবা, ভাই খাচ্ছে না।
> কি রে শূয়রের বাচ্চা! কী খাবি, কী সালন খাবি?
> বলির পাঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে মন্নু বলে : আমি মুলা খাব না।
> দেরি হয় না, তজুর হাত কখনো ইতস্তত করে না, দুমদুম মন্নুর পিঠের উপর পড়তে থাকে : কী খাবি শালার বেটা শালা, ক?"[৫]

সন্তানকেই শুধু নয়; তজুর এই বিপর্যস্ত সংকটে তজুর স্ত্রীও তজুর তীব্র বাক্যবাণে পতিত হয় -

> "বৌকে লক্ষ্য করে তজু চেঁচিয়ে ওঠে : তুই শূয়র, তোর বাপ দাদা সাতগুষ্টি শূয়র!"[৬]

অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি সুদৃঢ় না হলে ব্যক্তির যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট তীব্র হয় তার যথার্থ প্রকাশ আলোচ্য গল্পটিতে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত নড়েবড়ে হওয়ায় তজুর ব্যক্তি সংকট সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে।

'আয়ষা' (১৩৪৪) গল্পটি *মাটির পৃথিবী* ও *আয়ষা* গ্রন্থে 'আয়ষা' নামে পরিচিত হলেও শ্রেষ্ঠগল্পে তা 'মা' নামকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়। সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত লেখকের *গল্প সমগ্রতে*-ও এ গল্পটি 'মা' নামকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রামীণ জনপদে বসবাস করেও দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত এ গল্পের 'আয়ষা' চরিত্রটি দৃঢ়চিত্ত ও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী। নানাবিধ প্রাচীন মূল্যবোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, মিথ্যা আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার অহমিকায় আক্রান্ত একটি পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার বাস্তবচিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম্য কোন্দল-দলাদলি-প্রতিশোধস্পৃহা, কৌলিন্য প্রথার সমান্তরালে বাঙালি নারীর শাশ্বত মাতৃরূপ ও স্বামীর প্রতি সততা-একনিষ্ঠতা এ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজপতিদের প্রদত্ত 'ফৎওয়া' জর্জরিত গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রকৃতরূপ উন্মোচনে লেখকের প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। ধর্মের নামে তাদের ফতোয়াবাজির নমুনা নিম্নরূপ -

> "তাহারা আশেপাশের প্রায় দশটি গ্রামের মৌলবি হইতে দস্তখত করাইয়া এক ফৎওয়া আনিলÑ হামিদ তালাক দেওয়া বৌ লইয়া ঘর করিতেছে, তাহাকে একঘরে করা প্রত্যেক মোমিন মুসলমানের কর্তব্য।"[৭]

'একখানি হাসি' (১৩৪৫) গল্পের প্রধান অবলম্বন তির্যক ব্যঙ্গরস। রফিক মাস্টার উচ্চশিক্ষিত, পেশায় শিক্ষক অথচ আত্মঅহংকারী। তার ক্লাসের লাজুক ছাত্র মনিরের ঈষৎ বঙ্কিম হাসি তাকে পীড়া দেয় এবং এই হাসিজনিত পীড়া তার মানসিক বৈকল্য ঘটায়। ফলে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। এক সময় চিত্ত-দৌর্বল্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয়ী করে এবং সে কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ গল্পে রফিক মাস্টারের ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। লেখাপড়ায় তুখোড় এই মানুষটির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন -

> "পুরাতন স্কুল, নূতন মাস্টার। বয়স ও ডিগ্রির খ্যাতি দেখে নিযুক্ত করা গেছে। সদ্য কলেজ বিজয়ী নন; ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দিকে তিনি কলেজ কুরুক্ষেত্র একরকম শ্রীকৃষ্ণের মতোই জয় করে সেরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, দুর্ভাগ্য দেশের। তিনি ডিপুটিও হলেন না, উকিলও না; রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মোটা ফাইল পরিষ্কার করলে এত দিনে তিনি হেডের এসিস্ট্যান্ট অন্তত হয়ে যেতেন। কিন্তু ওই মোটা মাইনের লোভই তাঁর হল না কোনোদিন।"[৮]

শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে রফিক মাস্টারের শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্তিতে তার আত্মঅহংবোধ প্রতিপদে তাকে দ্বান্দ্বিক চরিত্রে পরিণত করেছে। ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে তাকে। সমাজ সংকটের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিপতিত হয়ে রফিক মাস্টার ব্যক্তিগত সংকটের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তার চাকরি থেকে অব্যাহতি দানের মুহূর্তে যখন নিকুঞ্জবাবা তাকে বলেন -

> এ কি ভাল করলেন? এ বুড়ো বয়সে খামখা আবার কোথায় গিয়ে চাকরি খুঁজবেন?[৯]

তখন এর উত্তরে রফিক মাস্টারের আত্মগর্বী উচ্চারণ -

> "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার কাজ করে জীবন কাটালাম বলে নিজে এখনো গাধা হয়ে যাই নি। আগের চাকরিতে আমি রিজাইন দিইনি, চার মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম।"[১০]

শিক্ষকতা-জীবনের রূঢ় কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা এই গল্পটিকে বেদনাঘন রসমূর্তিতে রূপায়িত করেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় স্কুল-শিক্ষকের বিড়ম্বিত জীবন লেখক আবুল ফজলের অন্তর্দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে।

মানব জীবনের বিচিত্র কর্ম, দুর্জ্ঞেয় মন-রহস্য এবং প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' (১৩৪৫) গল্পের কাহিনি। গল্পটি আবাল্য হাঁপানি রোগাক্রান্ত ফুলির উপেক্ষিত-অত্যাচারিত জীবনকথার সফল চিত্রায়ণ। সুস্থ দেহ-মন নিয়ে ফুলি বেড়ে ওঠেনি বলে চতুর্থ স্ত্রীরূপে বিপত্নীক বসিরের সাথে তার বিয়ে হয়। চতুর্থ স্ত্রীর এক বছরের মধ্যে মৃত্যুর পর পঞ্চম স্ত্রী দীর্ঘজীবী হবে জ্যোতিষীর এরূপ ভবিষ্যতবাণী বিশ্বাস করে বসির রোগাক্রান্ত ফুলিকে বিয়ে করে। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ফুলি সুস্থ হয়ে ওঠে। এ গল্পে হতাশার অন্তরাল থেকে জীবনের ধ্বন্যাত্মক দিকে উত্তরণের লক্ষ্যে জীবনবাদী আবুল ফজল মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আবুল ফজল 'পরদেশীয়া' (১৩৩৪) গল্পে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বাঙালি মুসলিম নারীরা যে খুব খারাপ অবস্থায় আছে তা উল্লেখ করেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীরা ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার কারণে প্রতিদিন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে তার উল্লেখ গল্পের মধ্যে দিয়ে করেছেন। একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথা নারীদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, অপরদিকে অশিক্ষা, কুসংস্কারও নারীসমাজকে নিমজ্জিত করেছেন তার উল্লেখ আলোচ্য গল্পটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম নারীদের যন্ত্রণাকে আবুল ফজল গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবুল ফজলের 'জনক' (১৩৩৪) গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করেছে। চৌধুরী সাহেবের মতো মুখোশধারী লোকেরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় যত অন্যায়ই করুক না কেন টাকা দিয়ে সব ঢেকে দিতে পারেন, এ গল্পটিতে সমাজের সেই নৈতিকতার সংকটের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন লেখক। ব্যক্তি চৌধুরী জমিদার ও বড় ব্যবসায়ী হয়েও নৈতিক স্খলনের কারণে তার মানসিক সংকট সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। জীবনের বাকি সময়টা যখন তিনি মক্কায় গিয়ে কাটাতে চেয়েছেন ঠিক সে মুহূর্তে এক বিধবা প্রজা এসে তার নিজের সন্তানের জন্য জমিদারীর কিছু অংশের ভাগ চেয়ে বসে। যথারীতি জমিদার সাহেব তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর কিছু দিনের মধ্যেই এই দেশ বিখ্যাত জমিদারের নামে এক সমন এসে উপস্থিত হল - ফাতেমা খোরাকির দাবি করে নালিশ করেছে। কিন্তু চৌধুরী সাহেব এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন, যে বড় মৌলবি সাহেব তাঁদের বিয়ের কার্য সম্পাদন করেছিলেন তিনি অনেক টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নিলেন। সমাজের বিপর্যস্ত এই রূপ আবুল ফজলের আলোচ্য গল্পে গভীর ছায়া ফেলেছে। চৌধুরী সাহেবের ব্যক্তিক সংকট এবং সামাজিক অবস্থানগত সংকটের মিথস্ক্রিয়ায় গল্পটি প্রাতিস্বিক হয়ে উঠেছে। বস্তুত জমিদার শ্রেণি, ব্যবসায়ী ও মৌলবিরা ইসলাম ধর্মের নামে কীভাবে মানুষকে শোষণ করে ও নারীকে ভোগ করে তার প্রকৃত বিবরণ আলোচ্য গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

আবুল ফজল 'জনক' (১৩৩৯) গল্পটির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের জমিদার, ব্যবসায়ী শ্রেণির মুখোশ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন। আবুল ফজল একাধিক গল্পের মধ্য দিয়ে নারী-হৃদয়ের অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন।

আবুল ফজলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আয়না*-তে *মাটির পৃথিবী* গ্রন্থের নয়টি এবং নতুন চারটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে সংযোজিত নতুন চারটি গল্প যথাক্রমে 'নিজের মা ও পরের বাপ' 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'প্রিয়ার চেয়ে প্রিয়' ও 'তিনবার'। এ গল্পগুলোতে সামাজিক সমস্যার গূঢ়তম দিক ভাবগম্ভীরতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 'নিজের মা ও পরের বাপ' গল্পে অপত্য স্নেহকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বার্থপরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সত্যটিও গল্পটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাৎসল্যপ্রীতির প্রশ্নে ধনী-দরিদ্র কোনো ভেদাভেদ নেই। ধনী চৌধুরী সাহেব এবং তার দরিদ্র ঝি সন্তানপ্রীতির প্রশ্নে একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে এই গল্পের মধ্যে। সামাজিক জীবনের অবস্থানগত সংকট স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে গিয়ে টিকতে পারেনি।

আয়না গ্রন্থের নতুন দ্বিতীয় গল্প 'উচ্চ ও তুচ্ছ' (১৩৪০)। এ গল্পটিতেও মানবজীবনের গূঢ়তম অথচ ব্যতিক্রমী দিকের উন্মোচন ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান নগরজীবনে স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারীর দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ ও যুদ্ধের অভিঘাতে দীর্ণপ্রায় জীবনযাত্রার ছবি এতে অঙ্কিত হয়েছে। দরিদ্র কেরানি আসগর আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও চিররুগ্ন স্ত্রীর রুই মাছের মুড়ো খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে যেদিন তা কিনে আনে সেদিনই তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। অস্বস্তিকর বিরুদ্ধ পরিবেশে ক্রমাগত অবস্থানের ফলে স্ত্রীবিয়োগে সে আপাত স্বস্তি বোধ করে এবং মুড়ো খাওয়ার প্রত্যয়ে স্থির থাকে। কিন্তু মৃত বাড়িতে রান্না করা নিষেধ - এমন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বাড়ির চাকর মাছের মুড়ো তার সহকর্মীকে দিয়ে দিলে আসগরের সে আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় না। দাম্পত্যজীবনের সঙ্গী স্ত্রীর বিয়োগব্যথা এবং ক্ষুধার্ত দেহের আকাঙ্ক্ষা অপূরিত হওয়ায় আসগর বিপন্নবোধ করে। ব্যক্তি সংকটের দ্বন্দ্ব ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব এই গল্পে উজ্জ্বল রূপে উপস্থাপিত হয়েছে আসগর চরিত্রের ভেতর দিয়ে। বিপন্ন ও ক্রন্দনরত আসগরের দ্বন্দ্বময় প্রবৃত্তি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য -

> "আজ সারাদিনের মধ্যে একটুখানি কান্নার সুযোগও সে পায়নি অথবা নিস্ফল জেনে কাঁদে নি। কিন্তু আশ্চর্য, শুতেই তার দুই চোখ জলে ডুবে গেল, কান্না কিছুতেই সে আর রুখতে পারলে না। এই কান্না কিসের জন্য? দেহের জন্য না মনের জন্য? পত্নী প্রেমের উচ্চ আবেগে, দশ বছরের জীবন সঙ্গিনীর জন্য, না এক সের এক ছটাক ওজনের নেহাৎ এক তুচ্ছ বস্তুর জন্য।"[১১]

প্রকৃত পক্ষে 'উচ্চ' ও 'তুচ্ছ' বলতে মন এবং দেহের ব্যাপার বোঝানো হয়েছে। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-মানবিকতা প্রভৃতি উচ্চ ও মহৎ বিষয়ের পাশাপাশি মাছের মুড়ো খাওয়ার লোভকে তুচ্ছ তথা দৈহিক বিষয়রূপে চিহ্নিত করে লেখক বিশেষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিস্থিতিতে তুচ্ছের কাছে উচ্চের পরাজয় দেখিয়েছেন। এ গল্পে স্বল্প পরিসরে একটি যুদ্ধের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। মাছের মুড়ো কেনার সময় মেছুনির সাথে আসগরের কথোপকথনে জাপানিদের কলকাতায় বোমা বর্ষণের প্রসঙ্গ এসেছে। মানবতাবিরোধী যুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনকেও তমসাচ্ছন্ন করে ফেলে। এ কারণে 'উচ্চ ও তুচ্ছ' গল্পে মেছুনি যেমন তার জীবিকা নিয়ে চিন্তিত তেমনি স্ত্রী-বিয়োগ সত্ত্বেও আসগর যুদ্ধ-পরাস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে চিন্তিত এবং ক্ষুৎপীড়ায় কাতর। এ পরিস্থিতিতেও বন্ধু হামিদ তাকে সান্ত্বনা দেয় -

> "বাক্ আপ্ ইয়ংম্যান। এক বৌ যাবে, এক বৌ আসবে, আসগরের সিংহাসন, না না, তক্তপোষ খালি নাহি রবে।"[১২]

> "গল্পটিতে জীবন সম্পর্কে লেখকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়।"[১৩]

'তিনবার' (১৩৫৩) গল্পটি বিষয় বিন্যাসে অভিনব। অধ্যাপক ইন্দু এবং ছাত্রী স্নেহলতার পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্কে বর্ণ-সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈদ্য- এ দু'সম্প্রদায়ের অসবর্ণ বিয়ে হিন্দুরীতি সম্মত নয় বলে ইন্দু ও স্নেহলতা 'সিভিল ম্যারেজ' করে। স্নেহলতার জাঁদরেল আইনজীবী পিতা মি. সেন আইনের কৌশল বের করে এ বিয়েকে অসিদ্ধ বললে তারা পুরোহিত ডেকে হিন্দু মতানুযায়ী বিবাহ করে। এতেও স্নেহ লতার পিতা অসম্মতি জ্ঞাপন ও বিরুদ্ধাচারণ করলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহ করে। এর ফলে স্নেহলতার সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হলেও বিয়ের তিন বছর পরে তাদের সন্তান জন্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছিন্ন সম্পর্ক যোজিত হয় অর্থাৎ সন্তান দাদু-নাতির সম্পর্ক স্থাপন করে পিতা-কন্যা-জামাতার মিলন ঘটিয়ে দেয়। তিনবার বিয়ে ঘটনা ঘটেছে বলে গল্পের নাম 'তিনবার'। এ গল্পে লেখকের প্রগতিশীল সমাজচেতনা, পরিশীলিত মূল্যবোধের পরিচয় লক্ষণীয়। এই পরিশীলিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের ইন্দু-স্নেহলতার সন্তানের নামকরণ প্রসঙ্গে। ইন্দুর মতে 'যিশু', স্নেহলতার মতে 'কৃষ্ণ' বা 'কানু', ইন্দুর বান্ধব অবরিন্দের মতে 'কৃষ্ণ-আহমদ' নামকরণ করা হলেও আবুল ফজলের মনের কথা উচ্চারিত হয়েছে মানবতার চেতনাদীপ্ত চরিত্র প্রীতির কণ্ঠে -

> "সব জাতের বিয়ের ফল এ, ওর কোনো জাত নেই, কোনো জাতের নামই ওকে দিয়ো না ও'র নাম রাখ শুকতারা, নতুন দিনের উদয়-চিহ্ন।[১৪]

আবুল ফজলের *শ্রেষ্ঠ গল্প* তিরিশটি গল্পের সংকলন। এ গ্রন্থে পূর্বের দুটি গ্রন্থের একুশটি ও নতুন নয়টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন - 'রাহু', 'সতীর সহমণ', 'কুমারী এ-মা', 'সাক্ষী', 'সিতারা', 'প্রেম ও মৃত্যু', 'বিবর্তন', 'কবিতার অপমৃত্যু' ও 'দ্বিতীয়বার'। উল্লেখ্য, এ পর্বের গল্পসমূহ দেশভাগ তথা ভারত-পাকিস্তানের জন্ম-উত্তরকালে রচিত। ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের তীব্র দ্বন্দ্বময়তার রূপটি এসব গল্পেও প্রযুক্ত হয়েছে লেখকের মননশীল চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে। 'সিতারা' (১৩৩৬) গল্পে প্রাচীন সামন্ত শ্রেণির জমিদার খানবাহাদুর-রায় বাহাদুর প্রভৃতির নৈতিক শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তঃসারশূন্যতার বাস্তব ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। বাইরে খান বাহাদুর জনাব এম মতিন হচ্ছেন একজন তসবিজপা পরহেজগার মানুষ। কিন্তু মাগরিবের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটান পতিতালয়ে। গল্পের নায়িকা সিতারা খান বাহাদুরের ঔরসজাত একজন পতিতার কন্যা। সুকৌশলে খান বাহাদুর কন্যা সিতারার বিয়েও দিলেন জমিদার পুত্র সৈয়দ আরশাদ হোসেনের সঙ্গে। এই জমিদারনন্দন জামাতার ও পতিতালয়ে গমনের অভ্যাস ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে সে উপস্থিত হল তার শাশুড়ি মনুজান বিবির ঘরে এবং সেখানে গিয়ে আরশাদ বুঝতে পারল সিতারার জন্ম রহস্য। খান বাহাদুরের কেলেঙ্কারি প্রকাশ না করার জন্য শ্বশুর তাকে অনেক ধন-সম্পত্তি দিতে চাইলে বাধ সাধে সিতারা। আরশাদকে উদ্দেশ্য করে সে বলে-

> "মনুজান-বাইজীর কাছে যখন গিয়েছিলে, শাশুড়ি ভেবে বা স্ত্রী মনে করে তো যাওনি, বেশ্যা ভেবেই তো গিয়েছিলে? তবে বেশ্যার মেয়ের প্রতি এত ঘৃণা যে? অথচ বেশ্যার মেয়ের টাকার পতি লোভ তো

> এতটুকুও কম নয়? বেশ্যার মেয়ের টাকা চাও নাকি? চাইলেই পাবে, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না। ঠোঁটে তার বিদ্রূপের বাঁকা রেখা। ... সত্যি এই টাকা চাও নাকি তুমি? চাইলে শরিয়ত মতো আমাকে তিন তালাক দাও, এক্ষণি সব টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বলো, তিন তালাক।”[১৫]

সিতারা অবশেষে তালাকের বিনিময়ে আরশাদকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়। সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ে ব্যক্তি আরশাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্র রূপায়ণে আলোচ্য গল্পটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে। সমালোচক মাহবুব বোরহান মন্তব্য করেছেন -

> “সিতারা গল্পে লেখক অভিজাত ক্ষয়িষ্ণু মুসলমানের পতিতাসক্ত ক্লেদময় জীবনকে রূপায়িত করেছেন। আবুল ফজল ক্ষয়িষ্ণু বনেদি মুসলমানের ক্লেদময় জীবনকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন তা থেকে লেখকের জীবনভাবনার গভীরতা এবং বহুমুখিতার পরিচয় পাওয়ায় যায়।”[১৬]

‘কুমারী এ-মা’ (১৩৪১) গল্পটি অতি আধুনিকা একজন নারীর অধঃপতন নিয়ে রচিত। সমগ্র গল্প জুড়েই তথাকথিত অতি আধুনিকতাচিহ্নিত এক নারীর প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই গল্পের নায়িকা এ-মার দম্ভভরা মেকি ব্যক্তিত্ব গল্পটিতে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। নারী স্বাধীনতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করার পর কোন উপায়ে একজন নারীকে সর্বনাশের পঙ্কে নিমজ্জিত করতে পারে তারই চিত্র গল্পকার এ-মার চরিত্রের ভিতর দিয়ে তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে আবুল ফজল অতি আধুনিক বাঙালি নারীর অন্তর্গত অসংগতিকে চিহ্নিত করেছেন। গল্পটির মধ্যে লেখকের মানবতান্ত্রিক জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে একজন মানুষ কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নিখুঁত চিত্র রয়েছে ‘সতীর সহমরণ’ (১৩৩৬) গল্পে। এই গল্পটিতে ব্যঙ্গ-রসাত্মক আবহের মাধ্যমে অন্তঃসারশূন্য সমাজকে সমালোচনা করা হয়েছে। শ্রীমন্ত বাবুর ছেলে শ্রীনাথ ছায়ার দিদিকে প্রেম নিবেদন করায় তার কিছুই হয়নি বরং ছায়ার দিদিকে সমাজ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ষাট বছরের বৃদ্ধের সাথে ছায়ার বিয়েতেও সমাজ কোনো আপত্তি তোলে নি। ছায়ার সহমরণে তার পিতা কমল বাবু নিজেকে ধন্য মনে করেছে। আর ছায়া সবাইকে অবাক করে দিয়ে শেষ মুহূর্তে স্বামীর চিতায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করল - হিন্দুর বিয়ে দেহগত নয়, শাস্ত্রগত। সমাজ সংকটের নিষ্ঠুরতায় ব্যক্তি মানসের দ্বান্দ্বিক চিত্র আলোচ্য গল্পটিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আবুল ফজলের ‘রাহু’ (১৩৩৯) গল্পেও ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী রাহেলার সাথে উচ্চ পদস্থ হাসানের সংসারজীবনের দ্বন্দ্বই এ গল্পে বর্ণিত। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের হাসান প্রথমা স্ত্রীর সাথে নামের সাদৃশ্যের কারণেই রাহেলাকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম পক্ষের কন্যা রাজুর সেবা যত্ন ও মৃত স্ত্রীর প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিচারণ রাহেলাকে হাসানের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে। সংসারে প্রতি মুহূর্তে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে থাকে। তাদের দাম্পত্যপ্রেমে হাসানের মৃত স্ত্রীর ছবি ও কন্যা ‘রাজু’ মানসিক দূরত্ব সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে। দ্বন্দ্ব আরো ঘনীভূত হয় যখন সন্তানসম্ভবা রাহেলা স্বামীর অবহেলার শিকার হয় এবং তারই অবহেলাজনিত কারণে স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটে। এ পর্যায়ে রাহেলা প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে ওঠে এবং একদিন সুযোগ বুঝে কেরোসিনের আগুনে রাজুকে পুড়িয়ে হত্যা করে। সমাজ সংসারে উপযুক্ত মর্যাদার অভাব ও স্বামীর উপেক্ষা জনিত ভালোবাসা রাহেলার ব্যক্তি সংকটকে আরো তীব্র করে তোলে। যার চূড়ান্ত পরিণতি রাজুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়। হাসান সব বুঝতে পেরেও মানবিকতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে রাহেলাকে সুস্থ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। গল্পের শেষান্তে এসে হাসান-রাহেলার জীবন রাহুমুক্ত হয়।

‘দ্বিতীয়বার’ (১৩৩৮) গল্পে ব্যক্তির চারিত্রিক স্খলনের কারণে যে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গল্পে ওয়াজেদের ব্যক্তিক সংকটের ফলে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। দাম্পত্য-দ্বন্দ্বজনিত কারণে ওয়াজেদ কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত ফিরোজার হতদরিদ্র জীবনযাপন ও পরে ইদ্দতের মাধ্যমে পুনরায় মিলিত হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে নারীর অন্তরবেদনা প্রকাশ করেছেন আবুল ফজল; সেইসঙ্গে নারীদের আত্মনির্ভর হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত নিম্নরূপ -

> “স্বামীর যথেচ্ছ তালাক ও পুনরায় বিয়ের পর স্ত্রীর মর্যাদাপূর্ণ আত্মোপলব্ধি বিষয়গুলো তিনি তাঁর গল্পে সামাজিক সমস্যা ও নারীর মর্যাদা রক্ষার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। প্রায় সব গল্পেই আবুল ফজল দেখিয়েছেন নারীর পূর্ণব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার পথে সমাজ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং এ সমাজের দৃশ্যমানশক্তি হচ্ছে পুরুষ জনগোষ্ঠী। যদিও পুরুষ এবং নারী একত্রিত হয়ে সমাজ-পরিবার গড়ে তোলে, তবু দেখা যাচ্ছে পুরুষ এগিয়ে যাচ্ছে, নারীর যাত্রাপথে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আবুল ফজল সমাজের এ একচক্ষু নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নারীর সমশক্তি, মর্যাদা, অধিকারের কথা বলেছেন।”[১৭]

ব্যক্তির নৈতিক সংকটের কারণে সমাজেও যে সংকট ঘণীভূত হয় তার যথার্থ পরিচয় রয়েছে ‘বিবর্তন’ (১৩৩৬) গল্পে। গল্পে দেখা যায় ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং সারা জীবন ধর্মানুসারে অতিবাহিত করেও শুধু একটি ভুলের কারণে মওলানা সাহেব সমাজের সবার কাছে ছোট হয়ে গেলেন। মওলানা সাহেব গতযৌবনা স্ত্রীর সঙ্গ লাভের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যখন আশ্রিতা পঙ্গু মেয়ে লুলির অনাঘ্রাত যৌবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তখন তিনি এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে না পারলেও পরবর্তীতে লুলি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়লে এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে তিনি হজে যাওয়ার মনস্থ করেন। ব্যক্তির এই চরম সংকটের কারণে সমাজ সংকটও তীব্র হয়ে ওঠে। গল্পের অন্তিমে সমাজ ও ব্যক্তির এই সাংঘর্ষিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে মওলানা সাহেব লুলিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মুক্ত হয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় -

> “বিবর্তন গল্পে আবুল ফজল অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে এক মওলানা চরিত্রের অধঃপতন দেখানো হয়েছে, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে নিজেকে সংশোধন করার একটা রাস্তা দেখানো হয়েছে গল্পের শেষভাগে।”[১৮]

সাত রকম রচনার সংকলন *সপ্তপর্ণ*তে ‘বিংশ শতাব্দী’, ‘গল্পের নমুনা’, ‘খেয়ালের খেলা’, ‘কবিতার কাঁটা’ ও ‘বিয়োগান্ত’ শীর্ষক পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে প্রকাশিত হলেও এ গল্পগুলো আবু ফজলের প্রথম দিকের রচনা এবং সমকালে বিভিন্ন পত পত্রিকায় প্রকাশিত। ‘বিংশ শতাব্দী’ (১৩৩৭) গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। যে-সমাজ ফিরোজাকে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে সেই সমাজ তার মৃত্যুর পর মৃতের সম্মান দেখায় না এবং যে ডাক্তার পতিতালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে সে অসুস্থ পতিতা ফিরোজার চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে মানবতার চরম অপমান ঘটায়।

‘কবিতার কাঁটা’ (১৩৩৭) গল্পের নায়ক মেয়েদের নিয়ে কবিতা লেখার জন্য সমাজে চরিত্রহীন বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, এ গল্পে সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে নায়কের ব্যক্তিক দ্বন্দ্বও উঠে এসেছে।

‘স্বনির্বাচিত গল্প’ আবুল ফজলের ষোলটি গল্পের সংকলন। এ গ্রন্থের ষোলটি গল্পের মধ্যে পনেরোটি নেয়া হয়েছে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ থেকে। এ গল্পের সংকলনে নতুন গল্পটির নাম ‘আক্কেল গুড়ুম’। যদিও গল্পটিতে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত।

আবুল ফজলের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ ‘মৃতের আত্মহত্যা’। এ গল্পগ্রন্থে ‘মৃতের আত্মহত্যা’, ‘নিহত ঘুম’, ‘ইতিহাসের কণ্ঠস্বর’, ‘কান্না’ - এই চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের নামগল্প ‘মৃতের আত্মহত্যা’ (১৯৭৭) য় সেনাবাহিনীতে কর্মরত জনৈক মেজর য়ূনুসের স্ত্রী সোহেলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিধৃত। একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মেজর য়ূনুসের সম্পৃক্ততা জানতে পেরে স্ত্রী সোহেলি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তার জাগতিক অনুভূতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। ঘাতক স্বামী ও বিপর্যস্ত জীবন থেকে এক সময় সে পলায়ন করে এবং উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এই গল্পে সোহেলির মানসিক দ্বন্দ্বের যে বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন তা বাস্তব। জন্মভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি প্রেম ও মমত্ববোধই সোহেলিকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দিয়েছে। খুনী স্বামীর কৃতকর্মের প্রতিবাদ করেছে সে আত্মহত্যার মাধ্যমে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে লেখক অবশিষ্ট তিনটি গল্প রচনা করেছেন। ‘নিহত ঘুম’ (১৯৭৭) গল্পটি এক মেজরের আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড দর্শনে তার ঘুম নিহত হয়েছে

এবং তিনি 'ইনসমনিয়া' আক্রান্ত হয়েছেন। সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে মেজর চরিত্রটির ব্যক্তিক সংকটের দ্বন্দ্বও গল্পে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হয়েছে।

সমাজ সংকটের দ্বান্দ্বিক অভিঘাতে পিষ্ট হয়ে ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকটও যে তীব্র হয়ে উঠতে পারে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে 'কান্না' (১৯৭৭) গল্পে। ছোট একটি ছেলে শাহীনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা এই গল্পের বিষয়বস্তু। ১৫ আগস্ট নিহত পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রুশোর সঙ্গে শাহীনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েকবার শাহীন রুশোদের বাসায় গিয়েছে। তার মায়ের সঙ্গে শাহীনের আলাপ হয়েছে। হঠাৎ এই বিভীষিকাময় রাতে রুশোর নিহত হওয়ার খবর শুনে তার মানসিক যে পরিবর্তন হয়েছে, 'কান্না' গল্পে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অস্বাভাবিক একটি মৃত্যু কিশোর মনেও যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারই বাস্তবরূপ আমরা 'কান্না' গল্পটিতে দেখতে পাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনচেতনা ও শিল্পরীতি অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে প্রাক-সাতচল্লিশ ছোটগল্পের ধারায় আবুল ফজলের স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজবোধ এবং ব্যক্তির জীবন নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এক নৈতিক আদর্শবাদ লক্ষ করা যায়। ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব রূপায়ণে তাঁর ছোটগল্পসমূহ অনতিক্রান্ত ও প্রাতিস্বিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। এখানেই জীবনাশ্রয়ী আবুল ফজলের বিংশ শতাব্দীর অন্বিষ্ট জীবনান্বেষণের পূর্ণতা ও সার্থকতা। তবে ছোটগল্পে শিল্পভাবনার দুর্বলতা কিংবা সীমাবদ্ধতা তাঁর গাল্পিক সত্তাকে করেছে দ্বিধাবিভক্ত।

> "আবুল ফজলের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক, কিন্তু অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি ছোটগল্পের সুঠাম কাঠামোতে সেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠুরূপ দিতে পারেন নি। ছোটগল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে বন্ধন, সেই বন্ধন তাঁর গল্পে সুদৃঢ় নয়।"[১৯]

সমালোচকের এ মন্তব্যের স্বীকরণ করেও আমাদের বিবেচনায় এ কথা বলা যেতে পারে আবুল ফজলের ছোটগল্প বাংলাদেশের ছোটগল্প ধারার ভিত্তি নির্মাণে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে।

> "শিল্পর কৌতুহল নিয়ে নয়, বরং মানবতাবাদী সমাজকর্মীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একটি যুগ ও সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য রচনা করে খণ্ডিত জীবনচেতনায় পূর্ণতা দান করেছেন।"[২০]

বলা যায় উদার, কুসংস্কারমুক্ত, উন্নত জীবনবোধ এবং পরিবর্তনকামী মানবতাবাদী প্রত্যয় আবুল ফজলের ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় ভাব-পরিমণ্ডল।

Reference:

১. মান্নান, মো: আব্দুল, *আবুল ফজলের প্রবন্ধে সমকালীন ভাবনা,* নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১
২. হক, সৈয়দ আজিজুল, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৮৮
৩. আহমদ, আশরাফ উদ্দীন, *মূলধারা সাহিত্যের রকমফের,* অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৯
৪. আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন (সম্পাদিত), *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ,* সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮
৫. ফজল, আবুল : 'মাটির পৃথিবী', *গল্প সমগ্র,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ৩
৬. পূর্বোক্ত
৭. ফজল, আবুল : 'আয়ষা', *গল্প সমগ্র,* প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬
৮. ফজল, আবুল : 'একখানি হাসি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
১০. পূর্বোক্ত
১১. ফজল, আবুল : 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৮-১২৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১৩. ডিনা, সরিফা সালোয়া, *কথাশিল্প অধ্যয়ন,* জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫৪

১৪. ফজল, আবুল : 'তিনবার', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৭

১৫. ফজল, আবুল : 'সিতারা', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৮

১৬. বোরহান, মাহবুব, 'আবুল ফজলের ছোটগল্প : জীবনভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য পত্রিকা, সিদ্দিকা মাহমুদা (সম্পাদিত), বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৮৮

১৭. আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন (সম্পাদিত), *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

১৮. আহমদ, আশরাফ উদ্দীন, *মূলধারা সাহিত্যের রকমফের,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯. ইসলাম, আজহার, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৪

২০. হক, খন্দকার সিরাজুল, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৬৭